শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম - ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬/ মৃত্যু - ১৬ই জানুয়ারি ১৯৩৮

সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার অন্তর্গত গ্রাম দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ও মা ভুবনমোহিনী দেবী। তিনি পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান। সেকালের তুলনায় শরৎচন্দ্রর বাবা যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু তখনকার কালে গ্রামবাসী বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের চাকরিবাকরির সুযোগ বিশেষ ছিল না বলে, এবং কিছুটা ভবঘুরে স্বভাবের জন্যও বটে, তাঁর দারিদ্র্য ঘোচে নি। এই দারিদ্র্যের জন্যই মাঝে মাঝে তাঁকে ভাগলপুরের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সপরিবারে উঠতে হত। শরৎচন্দ্রের সমস্ত ছাত্রজীবনটা কেটেছিল হুগলী ও ভাগলপুরের মধ্যে ভাগাভাগি করে। ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ছেদও পড়েছিল পড়াশুনায়। শেষ পর্যন্ত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এন্ট্রাস পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর দু বছর কলেজে পড়েন, কিন্তু টেস্ট পরীক্ষায় পাশ করেও তাঁর এফ্ এ পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। নিয়মমাফিক পড়াশোনা তিনি এখানেই শেষ করেছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর মায়েরও মৃত্যু হলে তাঁদের পরিবারটি ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছিল। বাবা ভাগলপুরের শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে ওখানকারই খঞ্জরপুর পল্লিতে একটি খোলার ঘরে থেকে কায়ক্লেশে জীবিকানির্বাহ করছিলেন।

এই পরিবেশে বাস করেও শরৎচন্দ্রের দু একটি সান্ত্বনাস্থল ছিল যেখানে গেলে তিনি মনে মনে আশ্রয় পেতেন। একটি হল স্থানীয় বাঙালীদের মিলনস্থল আদমপুর ক্লাব। অপরটি হল প্রতিবেশি বিভূতিভূষণ ভট্টের বাড়ি। এই জায়গাগুলিতে অভিনয় খেলাধূলা ও সাহিত্যচর্চার পরিবেশ ছিল। তাঁর মনের মধ্যে যে সাহিত্যিক সত্তাটি তখনও সুপ্ত রয়েছে তারই ধাত্রীগৃহ ছিল এখানে। শোনা যায় তিনি মুখে মুখে ভালো গল্প বানাতে পারতেন এবং হাতে লেখা পত্রিকাতেও লিখতেন। জীবনের এই সময়টাতে একটা বন্ধনহীন ভবঘুরে প্রবৃত্তি তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। কয়েক জায়গায় অত্যন্ত অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর চাকরি করেছেন; কখনও বা সন্ন্যাসীদলের সঙ্গে সন্ন্যাসী সেজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এইরকম এক দিশাহীন ভ্রমণের মাঝখানে তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ পান, এবং ভাগলপুরে ফিরে আসেন। এবার ছোট তিন ভাইবোনকে বিভিন্ন আত্মীয়বন্ধুদের ঘরে রেখে দিয়ে তিনি কলকাতায় এলেন অর্থোপার্জনের জন্য। তখন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ। প্রাক্ বঙ্গভঙ্গ যুগের যে কলকাতার ছবি আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যপর্বের উপন্যাস চোখের বালি, নৌকাডুবি, বা গোরাতে পাই এ সেই কলকাতা। তখন তা ভারতবর্ষের রাজধানী। কর্মে ও চিন্তায় নানাদিকে রেনেসাঁসের সুফল তখন সেখানে দেখা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু এ কলকাতায় বেশিদিন থাকা শরৎচন্দ্রের হয়ে ওঠে নি। মাস ছয়েক পরেই রেঙ্গুনের রেলওয়ে অফিসে একটি চাকরি পেয়ে শরৎচন্দ্র কলকাতা ছেড়ে রেঙ্গুনে পাড়ি দিলেন। কলকাতা থাকা কালে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা অবশ্য ঘটে গিয়েছিল। কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য নিজের এক আত্মীয়ের নামে তিনি মন্দির নামের একটি গল্প পাঠান, এবং দেড়শ গল্পের মধ্যে সেটিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। এটিই শরৎচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত রচনা। তবে স্বনামে নয়।

১৯০৩ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত দীর্ঘ তেরো বছর তিনি ব্রহ্মদেশে ছিলেন।। তাঁর সারা যৌবনকালটা ওখানেই কেটেছে। কিন্তু ওখানে তাঁর জীবনের কোনও বিশদ ও বিশ্বাস্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁর জীবনের এই পর্ব অন্ধকারে ঢাকা। সে অন্ধকার আরও ঘনীভূত করেছেন শরৎচন্দ্র নিজে, এবং ইচ্ছাকৃতভাবে। তিনি পরবর্তীকালে এক একজনের কাছে এক এক রকম গল্প বলেছেন। অনেক অতিরঞ্জিত গল্পও বলেছেন। নিজেকে নিয়ে এই কৌতুকের প্রবণতা তাঁর বরাবরই ছিল। সেইজন্য বিপদে পড়েছেন তংার জীবনীলেখকেরা। তবে একটা কথা ঠিক যে এই তেরো বছরে তাঁর জীবনে একটা স্থিতি এসেছিল। আগেকার দারিদ্র্যদুঃখ অবশ্যই ছিল না। একাধিক বার তিনি চাকরি বদল করেছেন ও নানারকম মানুষজনের সঙ্গে মিশেছেন। পল্লিগ্রামের জাতিভেদ, কুসংস্কার ও কূপমণ্ডুকতার বাইরে এসে খোলা চোখে মানুষকে দেখেছেন। তাঁর মানসিক জীবনে অবশ্যই সেই ভারসাম্য এসেছে যা যে কোনও শিল্পচর্চার প্রথম শর্ত। ওখানে বসেই তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু হল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ফনীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত 'যমুনা' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি গল্পটি প্রকাশিত হল। এই এক গল্পেই তিনি পাঠকমহলে বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তাঁর কাছে গল্প চেয়ে ভারতবর্ষ সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকা আবেদন জানালে তিনি তা রক্ষা করলেন এবং বাংলা সাহিত্যে যে একজন মহশক্তিধর নতুন লেখক এসেছেন এ বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ রইল না। কলকাতায় লেখকরূপে প্রতিষ্ঠা পাবার পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চাকরি ছেড়ে, রেঙ্গুন ছেড়ে, শরৎচন্দ্র পাকাপাকিভাবে এদেশে চলে এলেন। শুরু হল তাঁর নিরবচ্ছিন্ন লেখক জীবন।

প্রথমে তিনি ওঠেন হাওড়া শিবপুরে একটি ভাড়া বাড়িতে। হাওড়ায় তিনি বাস করেছিলেন বছর দশেক। তাঁর সাহিত্যজীবনের সবচেয়ে ফলবান পর্ব এটাই। লেখার সূত্রে দেশের নানা মনীষীর সঙ্গেও এখন তাঁর পরিচয় হল। দেশবন্ধুর অনুরোধে তিনি রাজনীতিতে যোগ দিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত টানা ষোল বছর তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তবে রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ ছিল সীমিত। সভা সমিতির চেয়ার ছেড়ে মাঠে ময়দানে তা কখনো প্রসারিত হয় নি। তা ছাড়া অহিংস কংগ্রেসের ছোটখাটো নেতা হলেও বিপ্লবী দল ও সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির প্রতি তাঁর একটা রোমান্টিক আকর্ষণ ছিল। পরে 'পথের দাবি' তে প্রকাশ পায়। শরৎচন্দ্রের এই হাওড়ার জীবন নানা দিক দিয়েই গৌরবময় । নতুন নতুন বই প্রকাশ হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ সহ দেশের যাবতীয় মনীষীর সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, ছোটবড় সবার কাছে সুখ্যাতি পাচ্ছেন, রাজনৈতিক নেতার সম্মান পাচ্ছেন, বৈষয়িক দিক দিয়েও তাঁর সাফল্য তখন তুঙ্গে, সেকালের পক্ষে তাঁর লেখার আয় তখন যথেষ্টই বেশি; তবুও শহরের জীবন তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। হাওড়া জেলারই বাগনানের কাছে রুপনারায়নের তীরে সামতাবেড় গ্রামে একটি সুন্দর এবং বড়সড় দোতলা মাটির বাড়ি তৈরি করে শরৎচন্দ্র সেখানে উঠে গেলেন। তখন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ।

সামতাবেড়ে থাকলেও লেখালিখির প্রয়োজনে কলকাতায় তাঁকে আসতেই হোত। তাই ১৯৩৪ নাগাদ কলকাতার বালিগঞ্জে অশ্বিনী দত্ত রোডে তিনি একটি বাড়ি তৈরি করান। জীবনের বাকি বছরগুলি তিনি কখনও কলকাতা কখনও সামতাবেড় এইভাবে থাকতেন। যেখানেই থাকুন তাঁর বাড়িতে অতিথিসমাগম লেগেই থাকত। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল, উদার এবং দানশীল। পশুপক্ষী পছন্দ করতেন। বন্ধুবান্ধব নিয়ে বসে জমিয়ে গল্প করতে তাঁর ছিল বিশেষ আনন্দ।

সামতাবেড় যাবার পর থেকেই তাঁর লেখার স্রোত ক্রমেই মন্দীভূত হয়। শেষ দিকে নানারকম ব্যাধিও তাঁকে আক্রমণ করে। অবশেষে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তাঁর মৃত্যু হল। মৃত্যুর খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্মান জানিয়ে যে ক্ষুদ্র কবিতাটি লিখেছিলেন সেখানেই ঘোষিত হয়েছে তাঁর অমরতার স্বীকৃতি—

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিযাছে ধরি।

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টিসন্ধান